রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং পরবর্তী সময়ের বাংলা গান

পল্লব কীর্ত্তনীয়া

আমাদের বাংলা আধুনিক গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রভাব অনেকটাই। রবীন্দ্রনাথের গান যেমন বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছে কিন্তু তার একটা বিপদও ছিল। বহুদিন পর্যন্ত বাংলা গান রবীন্দ্র ছায়াছন্ন ছিল অর্থাৎ রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বাংলা গান আশি বা নব্বইয়ের দশক পর্যন্তও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। বা বলা যেতে পারেপ্রভাব থাকলেও পরবর্তীকালের গান সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সার্থক বাংলা গান হবে কথা-সুরের অর্ধনারীশ্বর। শুধু বলেননি তাঁর সারাজীবনের সংগীত সৃষ্টিতে প্রমাণ রেখে গেছেন। হিন্দুস্থানী সংগীতের ধাঁচে সে যুগের বাংলা গানে অকিঞ্চিতকর কথার উপর রাগাশ্রয়ী সুরে কালোয়াতির যে রূপটি প্রচলিত ছিল তাকে আশ্চর্য সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বদলে ফেলেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও সুরের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটেছিল। অকিঞ্চিৎকর বাংলা গানের কথাকে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন কাব্যভাষা। গীতবিতানের অধিকাংশ গানকেই আমরা সুর বাদ দিয়ে কবিতা হিসেবে পড়তে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রত্তোর বাংলা আধুনিক গানের ক্ষেত্রে বা স্বর্ণযুগের গানের ক্ষেত্রেও কি সে কথা বলা যায়: রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতা যেমন আপন গতিতে এগিয়ে তার একটা নিজস্ব ঋজু পথ তৈরী করে নিয়েছিল। তাঁকে ছাপিয়ে ছাড়িয়ে গেছে বলাই বাহুল্য। বাংলা গল্প-উপন্যাসের ধারাও রবীন্দ্রনাথকে পেছনে ফেলেছে বহুদিন। কিন্তু গানের ভাষা: রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানের ভাষাকে যে কাব্যময়তা এবং আধুনিকতা দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে তা থেকে পিছু হটেছি আমরা। রবীন্দ্রসঙ্গীতে আমরা যখন পাই— 'হেথায় তরু তৃণ যত/ মাটির বাঁশি হতে ওঠে গানের মতো' বা 'তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে/ বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে'। এই 'বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে'-এর কাব্যময়তার সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারি না স্বর্ণযুগের 'তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার/ কানে কানে শুধু একবার বলো তুমি যে আমার' কিংবা 'আবার হবে গো দেখা/ এ দেখাই শেষ দেখা নয়তো' প্রভৃতি গানের কথা। কোনো তুলনাই চলে না। অথচ গান হিসেবে এগুলো অত্যন্ত সফল এবং জনপ্রিয়। আসলে এই গানগুলোর সুর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, যার কথার দুর্বলতাকে ছাপিয়ে চলে যায়। আমরা যে দুর্বলতা খেয়ালই করি না হয়তো। এর ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়, তাও দুটি একটি যেমন 'সোনা রোদের গান, আমার সবুজ পাতার গান' বা 'কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে...'। এরকম দু' একটি নমুনা বাদ দিলে বাকি গানের ভাষা অত্যন্ত ক্লিশে। উপমা, বিষয়বস্তু একইরকম ও বহু ব্যবহারে জীর্ণ। আরও একটা কথা এখানে বলা উচিত রবীন্দ্রছায়াচ্ছন্ন মূলধারার আধুনিক বাংলা গান সমসময় থেকে অনেকখানিই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল বিষয় ভাবনায়। এ জন্য রবীন্দ্রনাথই দায়ী অনেকাংশে। সমসময়ের ক্রোধ, ঘেন্না, ভালবাসা, প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথের গান এবং পরবর্তী সময়ে গানেও আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে যেমন প্রেম-পূজা-স্বদেশ প্রভৃতি পর্যায়ে ভাগ করে রেখে গেছেন।' পরবর্তী কালের গানও প্রায় সেই একই ধারায় চলতে থাকল। সমসাময়িক কোন ঘটনা সরাসরি ভাবে উঠে আসতে পারেনি। ভারতীয় গণনাট্য সংস্থার গানও যেমন অধিকাংশই স্লোগানে পরিণত হয় তেমন সলিল চৌধুরীর গানের ভাষাও ততটা আধুনিক হয়ে ওঠেনি। তাঁর ওপরেও ছিল মূলধারার আধুনিক গানের প্রভাব। যেমন তিনি লিখেছেন— 'ও মোর ময়না গো/ কার কারণে তুমি একেলা/ কার বিহনে বিহনে দিবানিশি যে উতলা...' বা 'দূর দূর দূর পানে আনমনে চাহিয়া।' সলিল চৌধুরীর বেশ কিছু গানের বিষয়ভাবনা অন্যরকম, সুর ও অ্যারেঞ্জমেন্টের আধুনিকতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু গানের ভাষা পুরোন। নতুন কোনো কাব্যজগতে নিয়ে যেতে পারে না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষার থেকে সলিল চৌধুরীর গানের ভাষাতেও তেমন উত্তরণ হয়নি গনসঙ্গীতের কিছু গান ছাড়া। যেহেতু গণসঙ্গীতের ধারা তাঁর হাতেই তৈরী এবং আধুনিকতার তিনি অন্যতম আইকন তাই তাঁর নামটাই উল্লেখ করছি। কিন্তু বিষয়ভাবনায় এগোলেও তাঁর গানেও রাবীন্দ্রিক ভাষার প্রভাব থেকেই গেছে। অর্থাৎ বাংলা কবিতায় যে ভাঙচুর চলছে, রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার সচেতন প্রয়াস ছিল, বাংলা আধুনিক গানের ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা হয়নি— না বিষয়ভাবনায় না ভাষাগত দিকে।

বাংলা গান কোন কোন জায়গায় রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হতে পারেনি একটু খতিয়ে দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথের সময় গল্প-উপন্যাস-কবিতা-গান সবই সাধুভাষায় রচিত। এবং সেটা সেই সময়ে খুব স্বাভাবিক ছিল। সেই সাধুভাষা ব্যবহারের প্রভাব থেকে গেছে পরবর্তী বাংলা গানেও। যেমন সলিল চৌধুরীর গানেই পাই - 'দূর দূর দূর পানে আনমনে চাহিয়া/ কোন বিরহের রাগিনী যাও গাহিয়া'। এই 'চাহিয়া', 'গাহিয়া' 'তব', 'মম' প্রভৃতি সাধুভাষার ভয়ঙ্কর ব্যবহার চোখে পড়ে। যদিও আধুনিক কবিতায় এই ব্যবহার তখন প্রায় উঠে গেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষার অনুসরণে যদি সত্তরের দশকেও গান লেখা হয় তবে তা সময়ের দাবীকেই অস্বীকার করে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে 'অ' কারন্ত উচ্চারণ পছন্দ করতেন। কখনও সুরের খাতিরে সেটা করতে হলেও, এই ব্যবহার অনবরত হতে থাকলে তা ললিতলবঙ্গলতা মার্কা হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রভাব পরবর্তী বাংলা গানেও ভীষণভাবে প্রকট। যেমন : রবীন্দ্রনাথের গানে পাই - দুঃখেরো বরষায় চক্ষেরও জল যেই নামল/ বক্ষেরো দরজায় বন্ধুরও রথ সেই থামল। কিংবা বাদলও দিনেরও প্রথমও কদমও ফুল। সুরটাই নমুনা পাওয়া যায়, যথা - আকশে উড়িছে বকোপাতি। এখানেও সরাসরি বকপাঁতি উচ্চারণ হচ্ছে না। আবার রবীন্দ্র কবিতাতেও দেখি, 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'বোধন' নামক কবিতায়- 'শীতের রথের ঘূর্ণি ধুলিতে/ গোধুলিরে করে ম্লানো/ তাহারি আড়ালে নবীন কালের/ কে আসিছে সে কি জানো'। এখানেও অন্ত্যমিলের খাতিরে ম্লানকে, ম্লানো উচ্চারণ করতে হয়।

কিংবা 'চৈতালী' কাব্যগ্রন্থের 'শেষচুম্বন' কবিতায় দেখি– 'প্রবেশিল বাতায়ণে পরিতাপ সম/ রক্তরশ্মি প্রভাতের আঘাত নির্মমো।' বা সেইক্ষণে গৃহদ্বারে সত্তর সঘন/ আমাদের সর্বশেষ বিদায় চুম্বনো। এখানোও সঘনও র সাথে মিলের জন্য চুম্বনও উচ্চারণ করতে তিনি আমাদের বাধ্য করেছেন। যদিও সাধারণভাবে চুম্বনকে কখনই আমরা চুম্বনো বলি না। এখন এই প্রভাবিত করল দেখা যাক। সন্ধ্যা মুখার্জীর গানে পাই 'মালারো শপথো লাগি বলো না আমারে'। অর্থাৎ মালার শপথ না লিখে লেখা হল মালারো শপথও। বা এরকম ভাবেই সুর করা হল। সলিল চৌধুরীর গানেও পাই– 'তোমারো পথো পানে চাহি/ আমারই পাখি গান গায়/ শিশিরো নীরে অবগাহি/ কাননো পথ ফুলে ছায়'। এখানেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পছন্দের 'অ' কারন্ত (অ > ও) উচ্চারণের অমোঘ প্রভাব। স্বর্ণযুগের বাংলা গান এই বহু ব্যবহারে জীর্ণ। অথচ আধুনিক কবিরা এই প্রভাব ততদিনে কাটিয়ে উঠেছেন। কিন্তু গীতিকাররা তখনও আচ্ছন্ন থেকেছেন। আর একটি দিক লক্ষ্যণীয় যে, সেই সময়ের কোন বড় মাপের কবিও গান রচনায় আসেনি।

এবার যদি গানের বিষয়গত দিকে আসা যায় দেখব স্বর্ণযুগের বাংলা গান বা রবীন্দ্রত্তোর বাংলা গান প্রেম-প্রকৃতি বা কিছু স্বদেশমূলক গানেই আটকে থেকেছে। সমসাময়িক ঘটনার সরাসরি প্রতিফলন বা একটি সামান্য ঘটনাকে নিয়ে একটি গান তৈরী প্রয়াস স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও ছিল না, পরবর্তীকালেও নয়। আমি এটিকে রবীন্দ্রনাথের একটি সীমাবদ্ধতা বলেই মানি। যে কোন তুচ্ছ ঘটনাকে তিনি সরাসরি সঙ্গীতের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করতে চাননি। তিনি বলেছেন— 'সঙ্গীত আমাদের হৃদয়ের সূক্ষ্মতম অনুভূতির প্রকাশ। শিল্পের অন্যধারায় যে অনুভূতি আমরা প্রকাশ করতে অক্ষম, সঙ্গীতে শুধুমাত্র সঙ্গীতেই হয়ত সেই সূক্ষ্মতম অনুভূতিগুলো প্রকাশ করা যায়।' একে তিনি তাই বলেছেন— 'ইথ্যারিয়াল'। আর এজন্যই তিনি বিশ্বাস করতেন না আমাদের জীবনে জমে ওঠা ক্লেদ, নষ্টামী, ক্রোধ, ঘেন্না ও পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা ভালবাসা এই সবকিছু নিয়ে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনাবলীও সঙ্গীতের বিষয়বস্তু হতে পারে। দিলীপকুমার রায়কে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে বাংলা গানের তুলনামূলক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন— 'ওরা কেমন অকিঞ্চিতকর কথা গানের মধ্যে অম্লান বদনে চালিয়ে দেয়। অক্ষমতাবশত নয়। সুরের তুলনায় তাদের কাছে কথার খাতির কম বলে। শ্যামলিয়নে, মোরি এ দরিয়া চোরি রে। এ দরিয়া মানে বুঝি জলের ঘড়ার বিড়ে। শ্যামচাঁদ সেটি চুরি করেছেন। কাজেই তার অভাবে শ্রীরাধার জল আনার মহা অসুবিধা ঘটেছে। এইটিই হল সঙ্গীতের বাক্যাংশ। অপরপক্ষে বাঙালী কবি এ দরিয়া চুরি নিয়ে পুলিশ কেস করতে পারে। কবিতা হতে পারে তবে সামান্য বা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মহৎ একটি গান নয় কেন: 'রানার' যে নমুনা তুলে ধরে। রবীন্দ্রনাথ সেরকম কাজ করেননি বা বিশ্বাসই করেননি। এমনকি তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের গানেও আমরা বুঝতে পারি না কোন ঘটনার অভিঘাতে গানটি রচিত। 'সর্বখর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' বা 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়' প্রভৃতি গানে বোঝা যাচ্ছে না কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে এই সৃষ্টি। আজকের দিনে সুমন যেমন স্ট্রেট বলছেন— 'আমি চাই সাঁওতাল তার ভাষায় বলবে রাষ্ট্রপুঞ্জে/ আমি চাই মহুয়া ফুটবে শৌখিনতার গোলাপ কুঞ্জে/ আমি চাই বিজেপি নেতার সালমা খাতুন পুত্রবধু— আমি চাই ধর্ম বলতে ধর্ম বুঝবে মানুষ শুধু'। এই সরাসরি উক্তি কি মহৎ সৃষ্টি হতে পারে না? কিন্তু কোন ঘটনাকে সরাসরি বিবৃত করেও যে মহৎ সৃষ্টি করা যায় রবীন্দ্রনাথ তা বিশ্বাস করতেন না। সে জন্য এরকম গান তিনি একটাও লেখেননি। এবং এই বিষয়টিই পরবর্তী বাংলা গানকে প্রভাবিত করেছে। IPTA -এর গানগুলো বাদ দিলে সরাসরি ঘটনা নিয়ে তৈরী গান খুব কম। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। যেমন : কফি হাউস বা রাণার। কিন্তু অধিকাংশ গানই ওই পথ অনুসরণ করেছে। সেখানেও স্বদেশের গান মানে 'ভারত আমার ভারতবর্ষ/ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো'। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে তৈরী গানের একটা বিপদ হল, সময় চলে গেলে গানটাও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'রাণার' বা 'গাঁয়ের বধূ' কিন্তু কালোত্তীর্ণ গান হতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ যদি এই বিশ্বাস রাখতেন তাহলে আমরা কিছু ভালো কাজ পেতেও পারতাম এবং বাংলা গানও সমৃদ্ধ হত। পরবর্তীকাছে সুমন, তারও আগে মহীনের ঘোড়াগুলি, এঁরা এই জমে ওঠা মেদ ঝরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

এবার রবীন্দ্রনাথের গান বা রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে কয়েকটা কথা বলতে চাই। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের গানকে আধুনিক প্রজন্মের কাছে প্যালেটেবল করে তোলার একটা চেষ্টা শুরু হয়েছে। কিন্তু যে কোন শিল্পেরই কোথায় হাত দেওয়া যায় আর কোথায় দেওয়া যায় না সেই সীমারেখা বোধটি অত্যন্ত জরুরী। যেমন মোনালিসার গোঁফ এঁকে দিয়ে আমি বলতে পারি না দারুণ কিছু সৃষ্টি করলাম। গান প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, কোনো গানেরই সুর বা তালের পরিবর্তন করা ঘোরতর অন্যায়। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন কোন কমপোজারের ক্ষেত্রেই এটা মেনে চলা উচিত। কিন্তু বর্তমানে খোদ রবীন্দ্রনাথের গানই সুর এবং তালের পরিবর্তন সহ আমাদের কানে আসছে। সুরের পরিবর্তন মানে কম্পোজারকেই উপেক্ষা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছিলেন উপদ্রব যদি করিতেই হয় হিটলার প্রভৃতির ন্যায় নিজের নাম নিয়ে করা ভাল। অর্থাৎ নিজে সৃষ্টি করে তার পরিবর্তন আনাই ভাল। অন্যের কম্পোজিসনে হাত দিলে তা উপদ্রবেই পর্যবসিত হয়। যে প্রবনতা আমরা এখন দেখছি খালি গলায় রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করতে কেউ এটার সঙ্গে একটা একতারা, গীটার বা অন্য কিছু যোগ করতে পারেন। বর্তমানে সাউন্ড এত উন্নত এবং বিভিন্ন ধরনের এত ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা সহজে পাচ্ছি যে আমরা সেগুলো ব্যবহার করতেই পারি। অ্যারেঞ্জার নিজেই সেখানে একজন স্রষ্টা। নাটকের ক্ষেত্রে একজন পরিচালক মঞ্চ ভাবনায় বা আলোতে যে স্বাধীনতা নেন এটাও সেরকম। তবে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যন্ত্রানুষঙ্গ যেন কখনই মূল গানকে, গানের সুর বা কথাকে ছাপিয়ে না যায়, নষ্ট না করে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল গায়কী। নিখুঁত স্বরলিপি মেপে গাইলেও গায়কীর

গুণে এক একটা গান অন্যরকম হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে সব গানকেই একটা বিশেষ ঢঙে গাওয়া হয়। এই গায়কী কোথা থেকে এসেছে তার কোন উত্তর পাইনি। তবে এই সব রবীন্দ্রসঙ্গীতকেই একই গায়কীর ছাঁচে ফেলার আমি বিরোধী। যেমন 'পূব হাওয়াতে দেয় দোলা...' গানটি যত দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর নিজস্ব গায়কিতে গাইলেন তখন হাওয়ার যে বিশালত্ব ধরা পড়ল তা প্রচলিত গায়কীতে কখনই পাওয়া যায় না। এই প্রত্যেক গানকে এক গায়কীর ছাঁচে ফেললে কী রকম অসুবিধা হয় তার একটা উদাহরণ দিই। এমনি করে যায় যদি দিন যাক না/ মন উড়েছে উড়ুক না রে মেলে দিয়ে গানের পাখনা— গানটি আমরা যখন চলতি গায়কীতে শুনি, অদ্ভুত বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হই। যদিও গানের কথা বিষণ্ণতার ইঙ্গিত আদৌ দিচ্ছে না। এখন এই গানটি পূরবী রাগে তৈরী। পূরবী বিষণ্ণতারই রাগ এবং রবীন্দ্রনাথ এই রাগ সম্পর্কে বলেছিলেন- শূণ্যচারিণী বিধবাসন্ধ্যার অশ্রুমোচন। তাহলে তিনি এরকম একটা আনন্দের গান, বিষণ্ণতার রাগে বাঁধলেন কেন? এর উত্তর আমি কোথাও পাইনি কিন্তু আমার মতে এটা তাঁর একটা এক্সপেরিমেন্ট। বাল্মিকী প্রতিভায় ডাকাতদের হাসির গানের ক্ষেত্রে রাগগুলিকে ভেঙেই তিনি একটা অন্যরকম ফর্ম তৈরী করে নেন। যাতে রাগগুলিকে আলাদা করে আর চেনা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রেও পূরবীর চালনে একটা স্বর থেকে আর একটি স্বরে গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়ার বদলে যদি নোটগুলো খাড়া খাড়া লাগাই তাহলেই পূরবীর এই বিষণ্ণতা হাওয়া হয়ে যায়। অর্থাৎ গানের কথা অনুযায়ী যদি স্ট্যাকাটো ফর্মে স্বরগুলো লাগে তাহলে পূরবীর ওই রাগরূপটি প্রকাশিত হচ্ছে না। নতুবা গায়কীর ফলেই আনন্দের গানটি বিষাদের গানে পরিণত হয়। যাতে গানটিই মরে যাচ্ছে। এই গায়কীর ক্ষেত্রেই দেবব্রত বিশ্বাস একমাত্র সবার থেকে আলাদা এবং যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহারেও। তাঁর এক্সপ্রেসন, দম নেওয়া, কথাগুলোকে অদ্ভুত জায়গায় কাটা - এইসবের ফলেই একেকটা গান উৎকর্ষ হয়ে উঠেছে। আরও একটা জিনিস লক্ষ্যণীয় যে একটা সময় পর্যন্ত বিশ্বাস করা হত শুধু ব্যরিটোন ভয়েসের গায়ক - গায়িকারাই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারেন। অন্যদের গলায় তা ঠিক মানায় না। যাঁরা লেজেন্ডস তাঁরা প্রত্যেকেই এই ব্যরিটোন ভয়েসের অধিকারী। মান্না দে, সন্ধ্যা মুখার্জী এরাও রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন, তবে সেই অর্থে নয়। কিন্তু এই বিশ্বাসও যথাযথ নয়, বলাই বাহুল্য। এক একটা গান, একেক রকমের গলায় মানায়। যেমন 'আকাশভরা সূর্য তারা' যেমন দেবব্রতর ভরাট উদাও গলায় মানানসই তেমন 'মম চিত্তে, নিতে নৃত্যে'র ক্ষেত্রে অমিত আরতি মুখার্জীর গলায় মিষ্টি রিনরিনে ভাবটিই পছন্দ করব। কিন্তু এই দ্বিতীয় গানটিই যদি কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক গাইতেন তাহলে ওই বিশেষ কণ্ঠস্বর এবং গায়কী চলে আসত। এই ছাঁচের গায়কী দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানকে কেন চিনতে হবে? এক্ষেত্রে শিল্পীর ইম্প্রোভাইজেসনের স্বাধীনতাটা জরুরী। তাই শিল্পী তার চিন্তাভাবনা অনুযায়ী পারেন তার পরিবেশনা। রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার ক্ষেত্রে কথার গুরুত্ব বোঝাটাই খুব দরকারী। যেহেতু তাঁর গানের কথায় আছে অসম্ভব কাব্যময়তা। এজন্যই রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীতের তুলনায় কাব্যসঙ্গীতই বেশী গাওয়া হয়। এবং তার মধ্যেও যেগুলি গান হিসেবে সার্থক, সফল। কথা ও সুরের রিপিটেসনে জর্জরিত নয়। ফলতঃ তাঁর গানের কথার গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন যদি 'ওগো নদী আপন বেগে পাগলপারা' গানটির কথা লক্ষ্য করি দেখব অসাধারণ এক চিত্রকল্প ফুটে ওঠে। নদী বয়ে যাচ্ছে। তার পাশে আছে চাঁপা গাছ। সে স্থির। বহতা নদীর চলাটা দেখা যায়। কিন্তু চাঁপাগাছেরও চলা আছে। সে বলছে— 'আমি সদা অচল থাকি/ গভীর চলা গোপন রাখি'। এবং তার চলা পাতায় পাতয়, ফুলের ধারায়। আকাশ জানে সেই আনন্দ। জানে নিশার নীরব তারা। কথা দিয়ে বোনা এই চিত্রময়তা ঘিরে এক অদ্ভুত জাগরণ ঘটায়। আর সেই আবেগের উৎসার না হলে গান তখন সুরের মাপকাঠিতে কিছু কথা আওড়ে যাওয়া হয়ে দাঁড়ায়। এই আবেগের স্ফূরণ ঘটাতে কথাগুলোই সাহায্য করে। অভিনেতা যেমন চরিত্রচিত্রণে চরিত্রটির মধ্যে মিশে যান তেমন এভাবেই গানের মধ্যে ঢুকে যাওয়া যায়।

আলোচনায় ইতি টানার সময় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে গান বলতে ছিল রাগসঙ্গীত, কবিগান, বা নিধুবাবুর টপ্পা জাতীয় কিছু। রবীন্দ্রনাথই বাংলা গানকে প্রকৃত অর্থে আধুনিক ও কাব্যময় করে তোলেন। তাঁর পথ ধরেই পরবর্তী সময়ের বাংলা মূলধারার গানের এগিয়ে চলা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ না থাকলে বাংলা গানের কি দূরবস্থা হত তা কল্পনাতীত। এবং রবীন্দ্রত্তোর সময়ের গীতিকাররা যদি তাঁর দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত না হতেন কিংব সেই সময়ের কবিরা যদি গান রচনা করতেন তাহলে স্বর্ণযুগের বাংলা গানও ভাষা এবং বিষয়বস্তুতে আধুনিকতার দোসর হয়ে উঠতে পারত। কারণ ঐ সময়ের সুরসৃষ্টি অসাধারণ, যা আজও আমাদের আবিষ্ট করে রাখে। ভাষার এই দুর্বলতা বা রবীন্দ্র নির্ভরতা আজকের বাংলা গান কাটিয়ে উঠেছে, বাংলা কবিতার মতোই। সুমনের বহু গানই উৎকৃষ্ট আধুনিক কবিতা। এবং সুমনের হাত ধরেই বাংলা গানে দারুণভাবে উঠে এসেছে সমসাময়িকতা। রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে বাংলা গানে যে মোচড়ের প্রয়োজন ছিল তা সুমনের কলম বা গীটারের মাধ্যমেই সম্ভভ হয়েছে। মহীনের ঘোড়াগুলিকেও একই কৃতিত্ব দেওয়া যায়, যদিও সত্তরের দশকেই তাদের নির্মিত ভাষা বা সুর গ্রহণের জন্য শ্রোতার মননের প্রস্তুতিপর্ব ও তখনও সারা হয়ে ওঠেনি। তাই এরা অনেকটাই অপ্রকাশিত থেকে গেছে। বর্তমানেও কথা ও সুরের দিক থেকে প্রচুর ভাল গান তৈরী হচ্ছে। যদিও গান শোনার মাধ্যম এত বেশী যে কোন গানই আমাদের রক্তে স্থায়ী হতে পারছে না। দ্বিতীয় গান এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতি কোন গানের ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যকর নয়। যতই ভাল কাজ হোক না কেন এই অবস্থা একটা গানের কালোত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাকেই নষ্ট করে দেয়। আর সমস্ত কালের সীমা অতিক্রম করে নক্ষত্রের মত থেকে যান রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর গান। আমার লড়াইয়ের দিনেও যেন গেয়ে উঠি 'বাঁধ ভেঙে দাও...' তেমনি গভীর দুঃখেও তিনিই যুগিয়ে দেন ভাষা, আমি গাইতে পারি —'পথিক পরাণ চল চল সে পথ দিয়ে তুই/ যে পথ দিয়ে গেল আমার বিকেললোর জুঁই।' এই 'বিকেলবেলার' শব্দটি'ই তখন হয়ে ওঠে আমার একমাত্র নিবিড় আশ্রয়।